সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপায়ণ

কুদরত-ই-হুদা*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের কবিতা বরাবরই রাজনীতিনিষ্ঠ ও মাটিলগ্ন। দেশকাল ও তাঁর সংকট-সম্ভাবনা বরাবরই দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে বাংলাদেশের কবিতার দীপ্ত চোখেমুখে, উঁচু নাকে; সর্ব অবয়বে। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব বাংলার বাঙালির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটানো। এই চেতনা তখনকার পূর্ব বাংলার সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর মৌতাতে পরিণত হয়েছিল। এই মৌতাতের শোভা-সৌন্দর্য-সুগন্ধি সমকালের কবিতায় আরেক নান্দনিক মৌতাত রচনা করেছিল। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা কীভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সেই অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়। প্রবন্ধে শুধু ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিদের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন খোঁজা হয়নি, বরং ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছে এমন সব কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপায়ণ কীভাবে হয়েছে তা খোঁজা হয়েছে।

বাংলাদেশের কবিতার প্রধান দুই-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করতে গেলে চট করে মাথায় আসে রাজনীতির কথা। কারণ, বাংলাদেশের কবিতা আদ্যোপান্ত রাজনীতি সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করে। বিশেষত ১৯৪৭ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত কবিতাকে মূলত রাজনীতিই শাসন করেছে। এই সময়পর্বের মধ্যে অন্য আরো অনেক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের কবিতা তার গায়ে অলংকারের মতো করে জড়িয়েছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাড়িয়ে রাজনীতিই বিচিত্র কারুকাজের গলার হারের মতো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যাকে আমরা বাংলাদেশের কবিতা বলি, তার জন্মই হয়েছে দেশভাগের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্তাপকে শুষে নিয়ে। কালক্রমে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি তার চরিত্র ও অভিমুখ পরিবর্তন করেছে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে ছাপিয়ে উঠেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশের কবিতাও জনমনের সেই জাতীয়তাবাদী রূপান্তরকে ধারণ করে ক্রম-পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ শতকের ষাটের দশক বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার তুঙ্গ দশক। স্বভাবতই এই দশকের কবিতায় বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা তার দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই

---

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীনগর সরকারি কলেজ, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.7

ছায়ায় স্পষ্ট হয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার নাক চোখ মুখ বলিরেখাসহ সর্ব অবয়ব। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন পুরাতন অধিকাংশ কবির রচিত কবিতা একারণে জাতীয়তাবাদী মিছিল, শ্লোগান, আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রতিরোধ-প্রতিবাদ, বিদ্রোহ-বিক্ষোভে উত্তাল।

জাতীয়তাবাদ মূলত একটি রাজনৈতিক ধারণা। এই ধারণা জন্মলাভ করে একটি জাতির মনে। আমরা এক, অন্যদের থেকে আলাদা – এই ধারণাই একটি জাতির চৈতন্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার সূত্রপাত ঘটায়। সাধারণত দীর্ঘ দিনের একই দুঃখভোগের ইতিহাস, একই ঐতিহ্য, ইতিহাস, বঞ্চনার বোধ একটি জাতিকে যখন একত্র করে তোলে এবং সংগ্রামী পথযাত্রায় বাধ্য করে তখন সেই অভিযাত্রাকে আখ্যা দেয়া হয় জাতীয়তাবাদ বলে। এর ফলে ওই জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট ভূগোলে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে সমান ইচ্ছা পোষণ করে এবং এই সমান ইচ্ছার ভিত্তিতে বসবাস করার সুযোগ পায় বা সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনা এভাবেই কাজ করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে-বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৭১ সালে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রথমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কেন্দ্র করে উন্মেষিত হলেও ক্রমে এর সঙ্গে আপামর জনতা পর্যন্ত যুক্ত হয়ে যায়। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগোষ্ঠীকে কীভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনা গ্রাস করেছিল তার এক দারুণ আলেখ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে সমকালের কবিতায়।

কবিতায় মিছিল আর গণজাগরণ; জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎসারণ

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা সমকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের চিত্রকে বাণীরূপ দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার অসামান্য শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে। কবিতায় মিছিল, মিছিলের মধ্যকার গণ-অনুভূতি, মিছিলের শক্তি, মিছিলের মানুষের মুখের স্বপ্ন-সম্ভাবনা আর স্বদেশের ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মিছিল দেখে হেলাল হাফিজ আবিষ্কার করেছেন মিছিলের মানুষের মনস্তত্ত্ব – 'মিছিলের সব হাত/কণ্ঠ/পা এক নয়।/সেখানে সংসারী থাকে, সংসার বিরাগী থাকে,/কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার/কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার।' (হেলাল ২০১৭ : ৯) এমনকি এক কবি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ দেখেছেন মিছিলের মধ্যে – 'তোমার আমার ভালোবাসাবাসি চুক্তি/স্বাক্ষরে সারা শহর উঠলো ফুঁসে।' (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩০/১) অর্থাৎ মিছিল আর গণজাগরণ স্বাভাবিকভাবেই কবির মনোজগতে হানা দিয়ে তার জায়গা ও গুরুত্ব আদায় করে নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী জাগরণের এই এক স্বভাব যে, সে অজান্তেই জনগোষ্ঠীর চৈতন্য আর সময়কে দখল দিয়ে ফেলে। আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)-এর *আশায় বসতি* (১৩৮১) কাব্যগ্রন্থের 'মিছিলে অনেক মুখ'

কবিতায় যেমনটি লক্ষ করা যায়– 'মিছিলের মুখ দেখো/দেখো তার সারা মুখে দেখো/দেশের আত্মার আভা;/দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ/অমর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো।' (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৭০/১) কবিতাংশে জাতীয়তাবাদী চেতনা কীভাবে মিছিলে ঝলসিত সেই চিত্র আঁকার পাশাপাশি সেই চেতনা কীভাবে চারপাশে সঞ্চরণশীল হয়েছে কবি তার এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন। আসলে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপটি তো এমনই ছিল যে, একই চেতনার, একই আকাঙ্ক্ষার পক্ষে সারা পূর্ব বাংলা দ্রুত এক হয়েছে। এর পক্ষে মিছিল হয়েছে। এক মিছিল থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য মিছিল। মিছিল ক্রমে ঢুকে পড়েছে বাঙালির ঘরে ঘরে। আহসান হাবীবের ভাষায়– 'মা বলে আমার দোয়া।/বোন বলে আছি অপেক্ষায়/ফুলের সম্ভার নিয়ে,/প্রিয়ার দু'হাত/প্রার্থনায় উত্তোলিত/পথের জনতা/ছড়ায় অসংখ্য ফুল উচ্চকণ্ঠে বলে জয় হোক।' (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৭০/১)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ব বাংলার অধিকাংশ সময় কেটেছে মিছিলে-মিটিংয়ে-শপথে-সংগ্রামে। যত দিন ঘনিয়েছে তত মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়েছে পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস। জাতীয়তাবাদী চেতনার আওতা দিন দিন এত বেশি বাড়ছিল যে, মিছিলে ডাকার মতো লোক আর যেন অবশিষ্ট ছিল না। জাতীয়তাবাদ কীভাবে তার আওতা বাড়াচ্ছিল আর মিছিলে প্রকম্পিত হচ্ছিল পূর্ব বাংলা, তা রূপ পেয়েছে নিম্নোক্ত কবিতায়–

কড়ির ওপরে কড়ি সাজাবার শখ ছিল যার
এখন মিছিলে।
কালো অন্ধকার গর্তে ছিলো যার রুপোর কারখানা
এখন মিছিলে।
শেষ রজনীর ক্লান্ত নূপুরের বুকে যারা মুখ থুবড়ে পড়েছিলো
এখন মিছিলে।
এখন মিছিলে দেখো মুখের সমাবেশ
সব মুখে একই আভা।
চিত্রিত দেশের
চূর্ণ আভা জ্বলে দেখো
মিছিলের সব মুখে মুখে।
সব মুখে দেশের আত্মার
আরশি যেন। সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন।
সারা দেশ সবাই মিছিলে। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৭৮-১৭৯/১)

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময়কার জাতীয়তাবাদী চেতনার সর্বাত্মক রূপ লক্ষ করা যায় সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩)-এর *একটি ইচ্ছা সহস্র পালে* (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের 'গণ-অভ্যুত্থান, ঊনসত্তর' কবিতায়ও। (সানাউল ১৯৯৮ : ১৯৭/১)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কবিতাকে রাজপথের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম এমন তীব্রতায় নাড়া দিয়েছিল যে, ষাটের দশকে শুধু নয়, যেসব কবির কবিতা বরাবরই তুলনামূলকভাবে বেশি রাজনীতি বিমুখ, যাঁদের কবিতা মূলত প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত রোমান্টিক আবেগ-অনুভূতিতে ঠাসা, তাঁদের কবিতায়ও তাঁরা ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মিছিল আর যূথবদ্ধতাকে তুলে এনেছেন; কখনো চকিতে কখনো অবিরলভাবে। যেমন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮); যাঁর মানসের মূল প্রবণতা রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে *প্রতনু প্রত্যাশা* (১৯৭৩) কাব্যের বিশেষত ১৯৬৯-৭০ সালে রচিত 'সুখ অসুখের সংশয়' অংশে মিছিল এবং যূথবদ্ধতাকে তিনি রূপ দিয়েছেন অবলীলায়– 'কবিদের কথা শোনো/সভ্যতার অলীক মুখোশ ছিঁড়ে/ময়দানে মিছিলে চলে এসো,/পরস্পরের দেহে হাত রাখো;/দেখো : ধুক পুক করে কিনা প্রাণ।' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৩৭) একই চেতনার আরো স্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্য– গণ-জাগরণের প্রত্যাশা ও প্রতীতি– লক্ষ করা যায় হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)-এর *যখন উদ্যত সঙ্গীন* (১৯৭২) কাব্যের 'অস্ত্র আমার' কবিতায়– 'মোহাচ্ছন্ন চোখে তোমার পড়ে না কিছুই।/দ্যাখো না লক্ষ কোটি তীব্র চোখ ভিন্ন আলো ফেলে,/কণ্ঠ তাদের আকাশ বাতাস চেরে?/অস্ত্র আমার তাদের চোখ,/অস্ত্র আমার কোটি কণ্ঠের ভাষা।' (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৪৫/১)

ষাটের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম যাঁর কবিতাকে সমূল কাঁপিয়ে দিয়েছে তিনি নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫)। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* (১৯৭০)-কে বলা যায় ষাটের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ছায়ায় বেড়ে ওঠা পরিপূর্ণ কাব্য। এই কাব্যের প্রেমে-অপ্রেমে, বিষণ্নতা-প্রসন্নতায়, দ্রোহে-প্রত্যয়ে সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের ঝাঁজ। 'হুলিয়া', 'সবুজ কাক', 'জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ', 'চুক্তি', 'ভালোবাসার টাকা', 'জলের সংসার', 'যানবাহন নেই', 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই', 'জালনোট', 'উন্নত হাত', 'অসমাপ্ত কবিতা', 'ভালোবাসার পুরনো বর্গায়', 'নির্জন হীরা জ্বাললে', 'স্বদেশের মুখ শেফালি পাতায়' 'কলম', 'হিমাংশুর স্ত্রীকে', 'লজ্জা', 'যুদ্ধ', 'পুনরুদ্ধার' কবিতাগুলোর প্রত্যেকটি কোনো না কোনোভাবে ষাটের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। এসব কবিতায় পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা, এর চাপ, তাপ রূপময় হয়ে উঠেছে। প্রথম কাব্যে জাতির সংকট-সম্ভাবনা, অহংকার, প্রতিরোধী চেতনা, আত্মত্যাগ এত প্রবলভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, নির্মলেন্দু গুণকে ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চেতনার গর্ভজাত কবিসত্তা বললে অত্যুক্তি হয় না। একারণে সমালোচক তাঁর *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো সম্পর্কে বলেছেন, 'উত্তাল ঊনসত্তর এবং সে-সময়ের আন্দোলন সংগ্রাম উঠে এসেছে তাঁর কবিতাগুলোতে।' (সৌমিত্র ২০১১ : ৫৬)

কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্পর্ধিত প্রকাশ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা

একটি জনগোষ্ঠী যখন জাতীয়তাবাদী আবেগে ধুকপুক করতে থাকে, তখন সেই জনগোষ্ঠী তার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করে। তার ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্য থেকে স্পর্ধার অধ্যায়গুলোকে সে শনাক্ত করে এবং এগুলোকে হৃদয়ে ধারণ করে বর্তমানে একসঙ্গে লড়াই-সংগ্রাম করার প্রেরণা বোধ করে। ষাটের দশকে রচিত বাংলাদেশের কবিতার সদরে-অন্দরে এই প্রবণতাটি বেশ লক্ষ করা যায়। ষাটের প্রথমার্ধের কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের রূপায়ণ আছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিরা আরো সচেতন এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। এপর্বে কবিরা খোলাসা করে প্রকাশ করেছেন পূর্ব বাংলার মানুষের শেকড়ের কথা, মূলের কথা। যেমন– 'দর্পের স্তম্ভিত অতীত সম্ভার পিঠে ঝুলিয়ে/স্বদেশের পরিব্রাজক আমি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে/সমুদ্র থেকে পাহাড়ে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে/সজল থেকে উষরে– আমার স্বদেশের/একাকারে আমার যাত্রার শেষ নেই।' (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১২৩/১)

আগেই বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম বিষয় হচ্ছে, এই চেতনা অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করে। জনগোষ্ঠীর অতীত অভিন্ন দুঃখভোগের ইতিহাস স্মরণ করে জাতীয়তাবাদী চেতনা শাণিত এবং আকরিত হয়ে ওঠে। দুঃখের দুঃসহ দিনে তাই কবি স্মরণ করেছেন অতীতের দুঃখময় ইতিহাস। আর এর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন বর্তমানের দৃঢ় প্রত্যয়–

ক্রুর (sic) পদাতিক যত যুগে যুগে
উদ্ধত পায়ের দাগ রেখে গেছে কোমল পলির ত্বকে,
বিভিন্ন মুখের কোটি অশ্বারোহী এসে
খুরে খুরে ক্ষতময় করে গেছে সহনীয়া মাটি,
লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান কতো
অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,
বিদীর্ণ বুক নীল বর্ণ হয়ে গেছ তুমি, বাংলাভূমি
নত হয়ে গেছে মুখ ক্ষোভে ও লজ্জায়।
এবার মোছাব সেই মুখ শোকাক্রান্ত, তোমার আপন পতাকায়। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৪৬/১)

এত উচ্চকণ্ঠ আর স্পষ্ট কবিতা ব্যতিক্রম ছাড়া ষাটের দশকের প্রথমার্ধে দেখা-ই যায় না। এর কারণ বোধ করি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের নানা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত। বাঙালির একত্র হওয়ার আভাসই কবির চৈতন্যে আরো দ্বিগুণ বেগে ও আবেগ আশাবাদের সঞ্চার করেছে। একারণে কবি খুব উচ্চকণ্ঠে আর গর্বের সঙ্গে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে স্মরণ ও প্রকাশ করেছেন।

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম যত মারমুখী হয়েছে, পাকিস্তানের অখণ্ডতার ব্যাপারটি পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে যত শিথিল হয়েছে, তত পূর্ব বাংলা আর এর জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতি-গৌরব, অহং স্পষ্টতা লাভ করেছে। বাঙালিত্বের বিষয়টি, বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিষয়টি ঘোষণার মতো হয়ে উঠেছে–

> আমিও বাংলার লোক, স্বভাবত বাংলার মতই
> সমতল, সংগীতের শস্যভারে নত, দূরগামী
> পদ্মার মতই ধীর, পলিমাটি আত্মায় সঞ্চিত।
> কিন্তু তাই বলে আমি নই যেন আয়ুধ বঞ্চিত।
> বর্ষায় কোমল কাদা, পোড়ামাটি চৈত্রে সেই আমি।
> লালনের দেশে জন্ম নিয়েছিল সিংহল বিজয়ী
> এবং গোপাল বাবু, পরিহাসে নির্মল বিশ্বাসী।
> মনে আছে? এত দুঃখ বাংলাদেশে, তবু আমি হাসি।[১] (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৪৭/১)

কবিতায় এমন শাসানি আর নির্ভার নিরলংকার জাতীয়তাবাদী অহংকার ষাটের শেষেই শুধু সম্ভব ছিল এবং হয়েছে।

নিজের ইতিহাস আর জন্ম নিয়ে অহংকার করা, আর অন্যের থেকে নিজেকে আলাদা ভাবা, জাতীয়তাবাদী চেতনার কেন্দ্রীয় স্বভাব। এই স্বভাবই একটি জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ স্বাধীনতা-স্বাধিকারের আন্দোলন-সংগ্রামের সময় আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয় বারবার। যেমন, আল মাহমুদের কবিতায় ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চারিত হয়েছে অহংকারী, তর্জনী-উঁচানো এই কথা–

> যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো, মানিনী
> একদা তারাই জেনো গড়েছিলো পুণ্ড্রের নগর
> মাটির আহার হয়ে গেছে সব, অথচ জানিনি
> কাজল জাতির রক্ত পান করে বটের শিকড়।
> আমারও নিবাস যেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে
> পূর্ব পুরুষেরা ছিলো পাণ্ডিকেরা পুরীর গৌরব...। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০৩)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে কবিতায় এই উচ্চারণকে কবিতা বলার চেয়ে শাসানি বা ঘোষণা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঘোষণার উৎস জাতীয়তাবাদী চেতনার মর্মমূলে নিহিত তাতে সন্দেহ কী!

কবিতায় ভাষা আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী চেতনা

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে অদ্যাবধি ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতা লেখা চলছে। কিন্তু ভাষা আন্দোলন বিষয়ক সব সময়ের কবিতার মেজাজ, ধরন-ধারণ, কবিতার ভেতরকার রূপ-রং, কবিচৈতন্য এক নয়। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতা কোনোভাবেই পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক অথবা ষাটের দশকের প্রথমার্ধের কবিতার মতো নয়।[২] এর কারণ সময়ভেদে দেশ-কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যকার জাতীয়তাবাদী চেতনার মাত্রার বদল ঘটেছে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমে সর্বব্যাপী রূপ নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনা ও এই চেতনাকেন্দ্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম যত তুঙ্গে উঠেছে, ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতার স্বরগ্রামও তত উপরে উঠেছে। কবিদের কবিতার ভাষার মধ্যে স্পষ্টতা এসেছে। কবিতা প্রত্যক্ষত জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে– 'যখন বাংলার বুকে দুঃশাসন পদভার কেঁপে ওঠে/রুদ্ধ করে দিতে চায় কণ্ঠময় সর্বজয়ী ভাষা/তখন সমস্ত দেশ কেমন দুর্জয় হয়/কেমন সংকল্পবদ্ধ ঋজু হয়–/কোনো উপমায়, কোনো তুলনায়/তাকে যায় না ধরা;/কেবল রক্তে রক্তে, শোণিত প্রবাহে ধ্বনিময়তার দুর্মর আলোড়ন।' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৩৯) উদ্ধৃতাংশের ভাষা আর চেতনার তেজ সহজেই চোখে পড়ে। ভাষা আন্দোলন বিষয়ক যেকোনো কবিতার চেয়ে এর মধ্যে কাব্যিকতা কম। এর বক্তব্য সরাসরি। কারণ বোধ করি কবিতাটির রচনাকালের মধ্যে নিহিত। কবিতাটি ষাটের দশকের উপান্তে রচিত, যখন জাতীয়তাবাদী চেতনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। তখন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের সফলতা পেরিয়ে ১৯৭০-এর নির্বাচনে বাঙালির জয় মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এই কবিতা যে-জাতীয়তাবাদী চেতনার অহংকারকে ধারণ করে আছে তা নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী জাগরিত জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবলতা থেকে জাত। প্রায় একই সময়ে রচিত সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় কবি একুশকে প্রকাশ করেছেন আরো স্পষ্টভাবে। এমনকি কবি তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন ক্ষিপ্ত জনরোষকেও। কবি উপলব্ধি করেছেন, জাতীয়তাবাদী জাগরণ এখন রোষে পরিণত হয়েছে। কবি তাঁর কবিতায় এই রোষকে শিল্পিত করেছেন ব্যঙ্গ আর হুশিয়ারি আকারে। কবিতায় "পাড়ার লোকে হানবে মুগুর" এক প্রকার হুশিয়ারিই বটে। লক্ষ করা যাক –

যা যা যা দূর হয়ে যা চোরের কুকুর
মালিকের নাগরা চেটে বল্‌গে হেসে হুজুর হুজুর।
এখানে মাসের ভাষা গাওনা হবে
মায়ের হাসি সব ছেলেদের পাওনা হবে,
গায়েন্‌রা তাই আসন ঘুরে
সাধছে গলা নতুন সুরে;
এখানে ঘেন্নাভরা
গা-ঘিন্‌ঘিন গন্ধঝরা
ভেউ ভেউ ডাক ডাকিস যদি
পাড়ার লোকে হানবে মুগুর। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪২৮-৪২৯)

এভাবে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতা ভাবে ভাষায় প্রকাশভঙ্গিতে প্রথমার্ধের কবিতা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে।

কবি যখন বলেন, 'রাইফেলধারী বেয়োনেটধারী শোনো/তোমাকে চিনেছি তুমি খুনী পুরাতন/আমার মায়ের কণ্ঠে চালাতে ছুরি/তুমি এসেছিলে সেই কবে ফাল্গুনে' (ফজল ২০১২ : ১৪৬/১) তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, কবি বাহান্নোর স্মৃতিকে একাত্তরে এসে ব্যবহার করছেন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শাণিত করার অভিপ্রায়ে। বাহান্নোর স্মৃতি যেখানেই ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সরলভাবে শুধু স্মৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বাহান্নর স্মৃতির এই ব্যবহারের মধ্যে একটি প্রতিরোধী দ্রোহী ভাব কাজ করেছে। অর্থাৎ কবিদের এই ব্যবহার শুধু স্মরণে সমর্পিত নয়, প্রতিরোধে জাগ্রত। আবার ষাটের দশকে এসে কখনো কখনো কবিরা ভাষা শহিদদের আত্মাহুতিকে বাংলার গর্বিত বিদ্রোহ-প্রতিবাদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনকে বাংলার মানুষের বিদ্রোহের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে লগ্ন করে দিয়ে বর্তমানের বিদ্রোহকে জাগাতে চেয়েছেন –

প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।
চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?
পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারীর শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।
প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৩৫৩)

একারণেই বোধ করি নির্মলেন্দু গুণ স্বদেশের উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে, কী আশ্চর্য,/সমস্ত যৌবন জুড়ে তর্ক ওঠে, আকাশে আগুন জ্বলে,/আন্দোলন বায়ান্নর পাঁচিল টপকায়।' (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৪৪/১)

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমানের প্রেরণার, বিশেষত আত্মাহুতির প্রেরণার উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁদের কবিতায়। যেমন ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির গণ অভ্যুত্থানের সময় কবি একুশ এবং একুশের আত্মাহুতির ইতিহাসকে দেখেছেন –

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরেথরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় – ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ। (শামসুর ২০১২ : ২৭২/১)

একই ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে লেখা সিকান্দার আবু জাফরের *বৃশ্চিক-লগ্ন* (১৯৭১) কাব্যের 'ইতিহাসের নীলাম' কবিতার কিছু চরণে। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪২৩) আবার কোনো কোনো কবি ভাষা আন্দোলনকে চৈতন্যের এত গভীরে নিয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর কাছে ভাষা আন্দোলন, শহিদ মিনার ইত্যাদির চেতনা বাতাসের মতো পরিচিত আর আপন হয়ে উঠেছে। আসাদ চৌধুরীর *তবক দেওয়া পান* (১৯৭৫) কাব্যের 'বাতাস যেমন পরিচিত' কবিতার একটি অংশ লক্ষ করা যাক –

আছেন বটে এমন মানুষ হয় নি দেখাই
দেখি নি যার যত্নে রাখা ঝাপসা ছবি
কুটুম্ব নন, আত্মীয় নন, শত্রুও নন,
পিতৃবন্ধু... এসব কিছুর ধার ধারে না,
অথচ তার আনাগোনা সকল ঘরে,
সবাই চেনেন, বাতাস যেমন পরিচিত।
লাল সবুজে ঝিলিক মারে কৃষ্ণচূড়া
পাগলা হ'য়ে ডাকতে থাকে কালো কোকিল
বাড়তে থাকে গাছের মতো শহীদ মিনার
বুকের ভিতর শেকড়গুলো আলাপ করে। (আসাদ ২০০৮ : ৩৮)

ষাটের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে এসব কবিতা যেমন রসদ সংগ্রহ করেছে, তেমনি এসব কবিতাও ষাটের শেষার্ধের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে জ্বালানি জুগিয়েছে।

কবিতায় সম্মিলিত প্রতিরোধ ও মুক্তির বাসনা

১৯৭০-এর নির্বাচনে বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় হয়। এরপর ক্ষমতা হস্তান্তরের তালবাহানা পূর্ব বাংলার মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত আলাদা করেছে।

এসময় পূর্ব বাংলার মানুষের পারস্পরিক একাত্মতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতির সঙ্গে কবিরাও একাত্ম হয়েছেন। এর ফলে কবিতা ক্রমাগত হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের হাতিয়ার। কবিতার মধ্যে সশস্ত্র মনোভঙ্গি ঢুকে পড়েছে। বিশেষত ২৫শে মার্চ যত সমাগত হয়েছে কবিতায় এবং বাস্তবে সশস্ত্র মনোভঙ্গি তত বেড়েছে। কবিতার এই মেজাজের শুরু অবশ্য উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান থেকেই হয়েছিল। '...বিশেষ করে উনসত্তরে সৃষ্ট স্বাদেশিকতার উত্তাপ অভাবিত মাত্রায় প্রখর হয়ে ওঠে সমাজ ও রাজনীতিকে ঘিরে; জাতীয়তার চেতনা বাঙালি জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ মানুষকে সহজেই ঐক্যবদ্ধ করে নেয়। ঐ উত্তাপ সর্বজনীন চরিত্র নিয়ে কবিতাকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে সত্তর থেকে একাত্তরে পৌঁছেও।' (আহমদ রফিক ২০০১ : ১৯৮) একারণে অন্য এক সামলোচক বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের আগে পূর্ববাংলার কবিতায় স্পষ্টত বুর্জোয়া মানবতাবাদী এবং মার্কসবাদী এই দুই ধারা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অবরুদ্ধ নয় মাসে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল কবিরা তখন স্বভূমির মানুষের এবং স্বভূমির মুক্তির লক্ষ্যে তাদের চেতনাকে শাণিত করেন।' (আমিনুর ১৯৯৮ : ৯১) ষাটের উপান্তে কবিদের এবং জনসাধারণের চেতনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেশ স্বাধীন করার, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার, দেশকে শত্রু মুক্ত করার, দেশকে সাম্রাজবাদ ও আধিপত্যবাদ মুক্ত করার প্রত্যয় দেখা যায়। ফলে, কবিদের কবিতার মধ্যে ফুটে ওঠে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ-সংগ্রামী চেতনা, সশস্ত্র মনোভঙ্গি। কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার যে-রূপটি প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা যায় জাতীয়তাবাদের যুদ্ধংদেহী রূপ। লক্ষ করা যাক পঞ্চাশের দশকের মৃদুভাষী কবির ষাটের উপান্তে লেখা কবিতা –

বাংলার বুকে উদ্যত বেয়োনেট
ঘরে ঘরে তাই প্রস্তুত প্রতিরোধ
চির দুর্মর সাতকোটি বেরিকেড
রক্তের ঋণ রক্তেই হবে শোধ।
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাড়া দেয় জনতাকে,
জাগে প্রত্যয় প্রতিটি শহরে গ্রামে;
সব সংশয় উত্তরণের ডাকে
বাঙালী শোণিত প্রস্তুত সংগ্রামে।
কোনোখানে কেউ বিমর্ষ নয় শোকে
মৃত্যুর ভয়ে বিচলিত কেউ নয়,
জনতার জয় সে কার সাধ্য রোখে
মৃত্যু পেরিয়ে হাসে মৃত্যুঞ্জয়। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৪৪)

পাকিস্তানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বাঙালি যে অকুতোভয় এবং বাঙালির তথা বাংলার বিজয় যে সুনিশ্চিত তা কবির ভাষায় রূপময় হয়ে উঠেছে এভাবে –

কি জাদু জানো যে তুমি ওগো মায়াবিনী
চুপি চুপি পোষো সকল জখম, যার
মাঝে জন্মে রক্তবীজ : তাদের বাহিনী
পাহাড়ে জঙ্গলে ঝোপে ক্রমশ দুর্বার :
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো মেঘবজ্রশাখা
প্রতিভোর সূর্য তোমার জয়পতাকা। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১৭৩/১)

উদ্ধৃতাংশে বাংলার প্রতি তথা বাঙালির ওপর পাকিস্তানের দীর্ঘ শোষণ-নির্যাতনের ইতিহাস (চুপি চুপি পোষো সকল জখম) যেমন আছে, তেমনি এর বিরুদ্ধে বাঙালির জাতীয়তাবাদী জাগরণের ওপর আস্থার প্রকাশও আছে।

পূর্ব বাংলার মানুষ দীর্ঘ শাসন আর শোষণের পর জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হয়েছে। এই জাগরণ বিস্ময় উৎপাদন করেছে পাকিস্তানি শাসকচক্রের মধ্যে। কবির ভাষায় এই দীর্ঘ শোষণ আর বাঙালির জাগরণ রূপময় হয়েছে এভাবে –

গ্রাম গঞ্জ জনপদ
দু'দশকে বড় বেশী বাকিও ছিল না।
যতদূর চোখ যেত দেখতাম শুধু
ফুটিফাটা বাংলাদেশ সমুদ্রের লোনা
জলে আক্রান্ত দ্বীপের মতো করে ধূ ধূ;
আর কিছু নয়। কোথাও প্রাণের সাড়া
যেন নেই, মৃত্যুময় নিস্তব্ধ, গুমোট।
হঠাৎ কি হলো কিসে জেগে ওঠে পাড়া
যেন মন্ত্রবলে। লক্ষ পায়ের দাপট।
কপাল তৃতীয় চোখ, হাতে রক্ত হেনা –
বুঝি এই বাংলাদেশ মরেও মরে না। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৪৬/১)

কবিতা যে প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে ষাটের শেষার্ধের এসব কবিতা সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিককার কবিতায় প্রথমার্ধের হতাশার ছাপ দুর্লক্ষ নয়। কিন্তু নানা আন্দোলন-সংগ্রাম যখন ক্রমে দানাদার হয়ে উঠেছে তখন গণমানুষের মতো কবির চেতনায়ও জেগে ওঠার এক ধরনের বাসনা শিল্পমূর্তি লাভ করেছে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম যখন ক্রমে বিকশিত হয় তখন প্রয়োজনে স্বদেশ ও স্বাধীনতার সাধ মানুষকে আত্মাহুতির প্রণোদনা দেয়। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের নির্দ্বিধ আত্মাহুতি জাতীয়তাবাদী আবেগের একই সূত্রেই গাঁথা। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় জেগে উঠে মুক্তির বাসনা এবং প্রয়োজনে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত থাকার দৃপ্ত শপথ –

আশা নাই, ভাষা নাই
প্রতিবাদ করবার। নাই সর্বনাশা
বহ্নি বিদ্রোহীর।
আছে শুধু দাহ।
কেন এই নিষ্প্রাণ হতাশা ?
একই অন্ধ বন্ধ কূপে ফিরে আসা বারবার।
জাল ছাড়া আর
হারাবার আছে কি এখনও ?
আর কোন পিছুটান, আর কোন ভয় ?
এবার হয়েছি নিঃসংশয়
মৃত্যুই মৃত্যুকে করে ক্ষয়। (আবুল হোসেন ১৯৯৭ : ৬২)

একই ধরনের প্রকাশ, অর্থাৎ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ওঠা, প্রতিকূলতাকে জয় করার দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ করা যায় আল মাহমুদের *সোনালি কাবিন* কাব্যে। কবিতায় পূর্ব বাংলাকে কবি তাঁর নারীর রূপকে তুলে ধরে বলেছেন –

অঘোর ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে মনসার কাল
লোহার বাসরে সতী কোন ফাঁকে ঢুকেছে নাগিনী,
আর কোনদিন বলো দেখবো কি নতুন সকাল ?
উষ্ণতার অধীশ্বর যে গোলক ওঠে প্রতিদিনই।
বিষের আতপে নীল প্রাণাধার করে থরো থরো
আমারে উঠিয়ে নাও হে বেহুলা, শরীরে তোমার,
প্রবল বাহুতে বেঁধে এ-গতর ধরো, সতী ধরো,
তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।
কুটিল কালের বিষে প্রাণ যদি শেষ হয়ে আসে,
কুন্তল এলিয়ে কন্যা শুরু করো রোদন পরম।
মৃত্যুর পিঞ্জর ভেঙে প্রাণপাখি ফিরুক তরাসে
জীবনের স্পর্ধা দেখে নত হোক প্রাণাহারী যম,

বসন বিদার করে নেচে ওঠো মরণের পাশে
নিটোল তোমার মূদ্রা পাল্টে দিক বাঁচার নিয়ম। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০৩)

যেকোনো জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে, তখন 'বাঁচার নিয়ম' যায় পাল্টে। প্রতিরোধ আর প্রয়োজনে আত্মাহুতিই হয়ে ওঠে সংগ্রামী জনগোষ্ঠীর শেষ অস্ত্র। জাতীয়তাবাদী চেতনার এই বাস্তবতাকে ষাটের শেষার্ধে বাংলাদেশের কবিরা রূপময় করে তুলেছেন।

কবিতায় আত্মত্যাগের প্রেরণার নির্মাণ

জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন দানা বাঁধতে থাকে তখন এর পক্ষের মানুষেরা তৈরি করতে চায় বিভিন্ন আইকন বা আদর্শ। এই আদর্শ তখন জনগোষ্ঠীর চৈতন্যে কাজ করে অনুপ্রেরণা হিসেবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা জাগরণ যেমন জনগোষ্ঠীর পূর্বতন আত্মত্যাগ বা যেকোনো বড় সম্মিলিত দুঃখকে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়ে তাকে ব্যবহার করে, তেমনি বর্তমানের নানা ত্যাগ বা দুঃখের ঘটনাকে প্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিহত কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে তাকে প্রতিরোধের হাতিয়ার করে তোলে এবং অন্য অনেককে একত্র হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই কাজটি ঘটে থাকে দুইভাবে। সরাসরি আন্দোলনের মাঠে রাজনৈতিক নেতারা একভাবে করে থাকেন। অন্যভাবে একই কাজটি করে থাকেন কবিরা। তাঁরা আত্মত্যাগীকে নিয়ে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করেন।[৩] যখন কবিতাটি ছড়িয়ে পড়ে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামও নতুন প্রাণ পায়। এভাবে কবিতায় নির্মিত হয় জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়ার প্রেরণা। পূর্ব বাংলায় এই ধারার জাতীয়তাবাদী জাগরণধর্মী কবিতার শুরু প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সাল থেকে। এটি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে। গণ-অভ্যুত্থানে নাম না জানা এক কিশোরের আত্মাহুতি এবং সেই আত্মাহুতিকে পরম্পরায় যুক্ত করে দিয়ে শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) রচনা করেছেন *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০) কাব্যের 'আমরা প্রার্থী তারই' কবিতাটি –

তোমার আমার কাঙ্ক্ষিত ভোর
আসার আগেই স্বপ্ন-বিভোর
তোমাকে হানল ওরা।
এই আলো আরো পবিত্র হবে
তোমার রক্ত-রাঙা বৈভবে,–
বলল ব্যাকুল পাখি।
যে-আলো তোমার চোখে নেচেছিল,
যে-আলো তোমার বুকে বেঁচেছিল
আমরা প্রার্থী তারই। (শামসুর ২০১২ : ২৭৯-২৮০/১)

এটা আসলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের স্বভাব। এই স্বভাবগুণে একের আত্মত্যাগ অনেকের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। একজন চেতনাগতভাবে ঢুকে পড়ে সবার মধ্যে। কবিরা তাঁদের কাব্য-কবিতায় এই কাজটিকে শিল্পিত করে তোলেন এবং আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলেন। যেমন –

এ লাশ আমরা রাখব কোথায় ?
তেমন যোগ্য সমাধি কই ?
মৃত্তিকা বলো পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর-জল –
সব কিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।
তাই তো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই। (শামসুর ২০১২ : ৩০৪/১)

শহিদ আসাদ, মতিউরকে নিয়ে তাৎক্ষণিক লেখা হয়েছে প্রচুর কবিতা। এসব কবিতা তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরো বেগবান করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন, শামসুর রাহমানের 'আসাদের শার্ট' অথবা আল মাহমুদের 'উনসত্তরের ছড়া-১'। 'আসাদের শার্ট' কবিতায় শামসুর রাহমান আসাদের শার্টকে জাতীয়তাবাদ উস্কে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি কবিতায় আসাদের শার্টকে রূপান্তরিত করেছেন পতাকায়। কবির ভাষায়– 'আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।' (শামসুর ২০১২ : ২৮০/১) একইভাবে ১৯৬৯ সালের পরে ব্যাপকভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের সময় যারা আত্মাহুতি দিয়েছে, নাম না-জানা তাদের নিয়ে তাৎক্ষণিক রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা। যেমন –

আর সে আসবে না। সাত মাস ফেরে না ঘরে।
মা কি জানেন, তার ঘর এখন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ঘরে ?
আর যত্নে সাজানো আহার্যের বদলে সে এখন গ্রহণ করছে
মানুষের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা, যা কেবল তার ক্ষুধাকেই নয়,
তার মৃত্যুকেও পরাহত করবে। মায়ের সমস্ত সুঘ্রাণ নিয়ে যে-কিশোর পড়ে থাকত
নিবিষ্ট সব বইয়ের পাতায়, তুমি কি জানো
বারুদের চড়চড়ে গন্ধে সে এখন পাঠ নয়, রচনা করছে ইতিহাস ? (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৪৯/১)

এই আত্মত্যাগের ইতিহাসকে স্মরণ করে আরো অনেককে এগিয়ে আসার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে কোনো কোনো কবির কবিতায়। যেমন, আল মাহমুদের কবিতায় আসাদ আর মতিউরকে অনুসরণের আহ্বান লক্ষ করা যায় সরাসরি– 'ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!/ট্রাকের মুখে আগুন দিতে মতিয়ুরকে ডাক।/কোথায় পাবো মতিয়ুরকে/ঘুমিয়ে

আছে সে!/তোরাই তবে সোনামাণিক/আগুন জ্বেলে দে।' এভাবে পাকিস্তান আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মাহুতি দেওয়া পূর্ব বাংলার শহিদদেরকে নিয়ে অসংখ্য কবিতা কালের স্মারক আর সংকটে প্রতিরোধী হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

বহু মানুষ সম্মিলিত হবার জাতীয়তাবাদী আহ্বান ও চিত্র

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে যখন নানা আন্দোলন-সংগ্রামে ফুঁসে উঠছিল পূর্ব বাংলা, তখন কবিরা রচনা করেছেন এমন কিছু কবিতা যেখানে কবি তাঁর জনগোষ্ঠীকে সম্মিলিত হবার আহ্বান করেছেন। কবি এক্ষেত্রে নেতার কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন। অথবা বলা যায়, নেতৃত্বের মধ্যে আহ্বানের পৌনঃপুনিকতা কবির মধ্যে জন্ম দিয়েছে আহ্বানের প্রেরণা – 'তাই এসো আমরা জন্মগ্রহণ করি/এবং প্রতি মৃত্যুকে আমরা ধারণ করি/যেমন আনন্দিত আতংকে বালক একটা তারাবাতি/জ্বলজ্বলে/গনগনে/সহাস্য/সচকিত/একটি শর্করা-শুভ্র অগ্নির/অবিরাম বিকিরণ।' (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৫৩/১) অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যায় বিপ্লবী আহ্বান – 'আমার দু-বাহু শীর্ণ তবু কারো কারো কাছে সোনালি সুন্দর/তারা আসে আসবেই/তারা গলে গলবেই/ছড়িয়ে দিয়েছি দুই শীর্ণ জীর্ণ লাল বাহু/রাজপথ কানাগলি ভাঙাচোরা রাস্তায়/ধরা দাও ধরা দাও যাদের বুকের মধ্যে/গাঢ় লাল পতাকা উড়ছে।' (হুমায়ুন ২০০৮ : ৪৫-৪৬) মিছিলে, সংগ্রামে, প্রতিরোধে শামিল হওয়ার এই আহ্বান নিশ্চয় সমকালে রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানের মতোই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির একটা বড় অংশকে প্রভাবিত করেছিল। কবিতায় কবিদের সেই আহ্বান কালের ঐতিহাসিক চিহ্ন বহন করে অনন্য হয়ে আছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানে আর কবি-সংস্কৃতিকর্মীদের আহ্বানে মানুষ ক্রমাগত সমাগত হয়েছে; সম্মিলিত হয়েছে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে দিন যত গড়াচ্ছিল তত বহু মানুষ জেগে উঠছিল। বহু মানুষ একত্র হচ্ছিল। বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে, বিশেষত শহরের আন্দোলন-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত জেগে উঠছিল গ্রাম। একত্র হচ্ছিল মানুষ। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ধাবমান হচ্ছিল শহর অভিমুখে। বহু মানুষের সম্মিলিত হবার আহ্বানের মতো বহু মানুষের একত্র হবার চিত্র, সম্মিলিত হবার চিত্র, জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তারের চিত্র, জমাট বাঁধার চিত্র কবিদের কবিতায় ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয়েছে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে। যেমন– 'দ্যাখো, আমি শৃংখলিত। কিন্তু/কী আমার শৃঙ্খল, আমার এই বাহু,/আমার কোটি কোটি বাহু।/এই শৃঙ্খলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ।' (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৫৪/১) আল মাহমুদের কবিতায় দেখা যায় গ্রামের মানুষের শহর অভিমুখী অভিযাত্রা –

কাতারে কে ডাকে নাম ধরে? আদেশের গম্ভীর নিনাদে
আমার নামের ধ্বনি আমারই শরীর ঘিরে ঘিরে
ঝিঁঝির শব্দের মতো ঢুকে গেলো গ্রামের ভিতর।
মনে হলো, ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ
অসংখ্য নাওয়ের বাদাম, মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে
জমা হয়ে যাবে এই চরের ওপর।
খেতের আড়াল থেকে কালো
মানুষেরা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে
কী ভাবে এগোবে তারা দুর্ভেদ্য নগরের তোরণে প্রথম। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৯৫)

জাতীয়তাবাদী চেতনা হচ্ছে কস্তুরী মৃগের মতো। সুবাসেই এর সার্থকতা। এই সুবাসকে কেন্দ্র করে শিকারির মতো এর দিকে ধাবমান হয় শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র জাতি। এই চেতনা একবার জমাট বাঁধলে বিচিত্র প্রান্ত থেকে মৌমাছির মতো ছুটে আসে মানুষ, আর তৈরি করে তোলে অপূর্ব মধুচক্র। এরকম দৃষ্টান্ত পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। বিচিত্র প্রান্ত থেকে বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার সেই মৌতাত রচনায়। ফুঁসে উঠেছিল অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। সম্মিলিত হয়েছিল এক কণ্ঠে। জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ চিত্রিত হয়েছে শামসুর রাহমানের *নিজ বাসভূমে* কাব্যের 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬-২০১৪)-এর *আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর* (১৯৬৯) 'বাংলা আমার সূর্য আমার'-এর মতো নানা কবির নানা কবিতায়। এসব কবিতায় চিত্রিত জাতীয়তাবাদী জাগরণের বিচিত্র চিত্র কবির কল্পনা নয়। বরং বলা যায়, ষাটের উপান্তে জাগরণের ঝাঁজ কবিতায় উত্তাপ ছড়িয়েছে; ছড়িয়েছে আশাবাদ। শামসুর রাহমানের *বন্দী শিবির থেকে* (১৯৭২) কাব্যের 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কবি জাতীয়তাবাদী চেতনায় শামিল হওয়া পূর্ব বাংলার মানুষের এক তালিকা হাজির করেছেন। এই তালিকা থেকে জাতীয়তাবাদী জাগরণের ব্যাপ্তি সহজেই অনুমান করা যায়। স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্যে কারা আশাবাদী এবং আত্মত্যাগে শামিল হয়েছে তার তালিকায় উঠে এসেছে 'মোল্লাবাড়ির এক বিধবা', 'হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী', 'সগীর আলী', 'শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,' 'কেষ্ট দাস', 'জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা', 'মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি', 'রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা', 'রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই তেজী তরুণ', এমনকি 'অবুঝ শিশু'। একইভাবে কবি তাঁর 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতার স্বপ্ন, সাধ আর স্বাদকে সঞ্চারিত করেছেন রবিঠাকুর থেকে মাঠের কৃষক পর্যন্ত। এর মধ্য দিয়ে ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার অসাম্প্রদায়িক ও শ্রেণিচেতনার স্বরূপটি খুব সহজেই উঠে এসেছে।

কবিতায় বাঙালিত্ব

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার মানুষ সায় দিয়েছিল মূলত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য। এছাড়া এই অংশের মানুষ মনে করেছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে 'দুর্বল' কোনো জনগোষ্ঠী আর বৈষম্যের শিকার হবে না। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে দেখা গেল, এ দুটির কোনোটাই বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। বরং পূর্ব বাংলা পূর্বের মতোই অবহেলার শিকার হয়েছে। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য আর আধিপত্যের শিকার হয়েছে বরাবরই। এসব বৈষম্যসহ পূর্ব বাংলার মানুষ দীর্ঘদিন পাকিস্তানের আবেগ লালন করেছে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় পূর্ব বাংলার সচেতন মহলের কাছে খটকা সৃষ্টি করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মুখের ভাষা কেন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবে না! এর মূলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিষয়টি স্পষ্ট ছিল। কিন্তু অনেকের মধ্যে এই ভাবনাও উঁকি দিয়েছিল যে, এর মধ্য দিয়ে হয়তো জাতিগতভাবে বাঙালিকে হেয় জ্ঞান করা হয়েছে। জাতিগতভাবে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের হেয় জ্ঞান করার এই বিষয়টি যত দিন গিয়েছে ততই স্পষ্ট হয়েছে। এটি প্রথম গণগ্রাহ্যতা লাভ করে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পাক-ভারত যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যবাহিনী লাহোর ফ্রন্টে যে-বীরত্বের স্বাক্ষর রাখে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র থেকে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা কেউই তার যথার্থ স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি বাঙালি সেনাদের এই কৃতিত্ব ছিনিয়ে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র। পাক-ভারত যুদ্ধের পরে বীরত্বের প্রায় একচ্ছত্র প্রশংসা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের।[৪] বাঙালি শারীরিকভাবে খর্বাকৃতি, তাদের পক্ষে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখানো অসম্ভব – এধরনের কথা আইয়ুব খানও অন্তরে পোষণ করতেন। একারণে তিনি ব্রিটিশদের দোহাই দিয়ে বাঙালিদের সেনাবাহিনীর অফিসার পদে নিয়োগ দিতে চাইতেন না। (মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ ২০১৪ : ২৫) এই ধরনের জাতি-বিদ্বেষমূলক চিন্তা আইয়ুব খানের আত্মজীবনীতেও আছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার বাঙালি-জাতি-বিদ্বেষমূলক চিন্তার আরো স্পষ্ট প্রমাণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নেওয়া।[৫] পাকিস্তানি শাসকচক্রের এই জাতি-বিদ্বেষের বিষয়টি পূর্ব বাংলার বাঙালি বরাবরই মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রতিবাদী প্রমাণ ১৯৬৯-এর পর থেকে বাঙালি জাতি ধারাবাহিকভাবে দিয়েছে। বাঙালি জাতির সর্বৈব জাগরণ ঘটে বিশেষত ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। জাতিগত অহংকারের ঢেউ এখানকার কাব্য-কবিতায়ও লেগেছে। কবিরা তাঁদের কবিতায় বাঙালি জাতির ইতিহাস নিয়ে গর্বিত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এই বাঙালি জাতি বলতে কবিরা যে-জাতির বয়ান-বর্ণনা হাজির করেছেন, তার মধ্যে 'অনার্য' জাতির বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে উঠেছে। কারণ, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এবং 'অভিজাত' শ্রেণির জাতিগত অহংকার ছিল যে, তারা আর্য বংশসম্ভূত। 'এ অঞ্চলের [পূর্ব বাংলা] জনগণকে, তাদের

ভাষা ও সংস্কৃতিকেও তারা হীন চোখে দেখত। এমন আচরণ করত যেন তারা জাতি হিসেবে শ্রেয়তর।' (আবু সাদাত ২০১৮ : ৩১) বাঙালি 'অনার্য' বংশসম্ভূত বলে তাদের এক ধরনের অবজ্ঞা ক্রিয়াশীল ছিল। একারণে ষাটের দশকে এসে বাঙালি তার যে-বাঙালিত্ব নিয়ে অহংকার করেছে, তার মধ্যে 'অনার্য' বৈশিষ্ট্যই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।[৬] পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়মূলক কথাবার্তা বিষয়ে অধিকাংশ কবি এখানকার মানুষদের অন্ত্যজ পরিচয়টি কখনো আড়াল করেননি।[৭] এই একই দৃষ্টিভঙ্গির অভিক্ষেপ ষাটের দশকের কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন, সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)-এর উপন্যাস। তিনি তাঁর একাধিক উপন্যাসে 'অনার্য'-জাগরণ দেখিয়েছেন। যেমন, *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৩৭৬)। তাঁর *পুরুষমেধ* (১৯৬৯) উপন্যাসটি তো রীতিমত আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের তথা দুটি সভ্যতার দ্বন্দ্বের উপন্যাস। (কুদরত ২০১৬ : ২২৩-২২৪) এমন কি 'আর্যদের' কথিত 'অনার্য' জাতির সত্যতা এবং 'আর্যদের' সভ্যতার প্রচলিত পাঠ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।[৮] ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর 'আর্যতার' অহংকারের বিপরীতে পূর্ব বাংলার কোনো সাহিত্যিকের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার এক বিপ্লবী প্রকাশ।

বাংলাদেশের ষাটের দশকে রচিত কবিতায় জাতি-গর্বের বিষয়টি সত্যেন সেনের মতো এত বিপ্লবাত্মক রূপে হাজির না হলেও, বাঙালিত্বের স্বাতন্ত্র্য আর এর অহংকারের রূপায়ণ করতে কবিরা পিছপা হননি। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক কবির মধ্যে বাঙালিত্বের অহংকারের বিষয়টি, তার তেজী আর বিদ্রোহী রূপটি ফুটে উঠেছে। আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬)-এর *সোনালি কাবিন* (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা 'সোনালি কাবিন'-এর পুরোটাই মূলত বাঙালি জাতির বিশিষ্ট নির্মাণে অনন্য হয়ে উঠেছে। পুরো কবিতায় তিনি 'বাঙালি কৌমের' স্বাতন্ত্র্য আর তার ধরন-ধারণ প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠেছেন। বাঙালি কৌমের স্বাতন্ত্র্যের জায়গা থেকে কবি বলেন– 'শরমিন্দা হলে তুমি ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে/মুছে দেবো আদ্যাক্ষর রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন।/বাঙালি কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী/জানতো না যা বাৎসায়ন, আর যত আর্যের যুবতী।' (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০০) কবিতাংশে সুস্পষ্টভাবে কবি যৌনতার রকমের প্রশ্নে 'বাঙালি কৌম'-কে 'বাৎসায়ন' এবং 'আর্য'-দের থেকে আলাদা করতে চেয়েছেন। একটি জাতি কেবল পোশাক-আশাক, ধর্ম-বিশ্বাস, খাদ্যাভাস আর বাহ্য-সাংস্কৃতিক চিহ্নের দিক থেকে আলাদা থাকে না, বরং যৌনতার উদ্‌যাপনের দিক থেকেও স্বতন্ত্র থাকে। একারণে এই কবি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমি 'সোনালি কাবিনে' অন্য এক বাংলার চিত্র, যা সুদূর অতীতের হয়েও সমকালেও দৃষ্টিগোচর, বয়ন করার চেষ্টা করেছি।" (আল মাহমুদ ২০০৩ : ১৬) আল মাহমুদ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই গভীর অথচ অপ্রকাশ্য বিষয়টির অবতারণা করে বাঙালিকে সমকালীন 'নাক-উঁচু' আর ধর্মীয় পরিচয়নিষ্ঠ পাকিস্তানি জাতিত্বের ধারণা থেকে আলাদা করে দেখেছেন। খেয়াল

করার বিষয়, কবি তাঁর নারীকে কী কী নামে সম্বোধন করেছেন। কবিতায় তিনি তাঁর নারীকে 'হরিণী', 'পানোখী', 'হংসিনী', 'বন্য বালিকা', 'প্রাণের শবরী', 'শ্যামাঙ্গী', 'কপোতী' ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছেন। এর মধ্য দিয়ে কবিতায় তিনি 'বাঙালি কৌমের' 'অনার্য' নারী সম্পর্কিত ধারণার প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু নারী সম্পর্কিত ধারণার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে নয়, বাঙালি জাতির ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্মাণের প্রচেষ্টায় আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় বলেছেন, 'মুকুন্দরামের রক্ত মিশে আছে এ-মাটির গায়'। আরো বলেছেন, 'আমার তো কপিলে বিশ্বাস'। উল্লেখ করেছেন, 'খনা', 'চর্যাপদ', 'মনসা', 'লোহার বাসর', 'পুণ্ড্র নগর', 'শ্রীজ্ঞান', 'শীলভদ্র', 'আলাওল', 'তরুণ লালন' 'দরিদ্র বাউল'-এর প্রসঙ্গ। এর প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতায় কবির দারুণ অহংকারের প্রকাশ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, তিনি কবিতায় বাঙালির অর্থনৈতিক বণ্টননীতি আর ধর্মনীতির – যেটি সমকালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত – ধারণারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে – 'পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,/এমন প্রেমের বাক্য সহাসিনী করো উচ্চারণ/যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।' (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০৪) এই অহংকার এবং ইতিহাসের উত্তরাধিকারের নির্মাণ-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার মর্মমূলকে ধারণ করে অনন্য মাত্রা লাভ করেছে।[৯] ষাটের কবিতার মতো বাংলাদেশের কবিতা বাঙালিত্ব নিয়ে অহংকারে আর কখনো বোধ করি এতটা মেতে ওঠেনি। ষাটে কবিদের এভাবে বাঙালিত্ব নিয়ে, এর সংজ্ঞায়ন নিয়ে, ঋজু অবস্থান নেওয়ার মূল কারণটি ষাটের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবল প্রতাপের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।

অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান

বাংলাদেশের কবিতা বরাবরই রাজনীতিনিষ্ঠ। কিন্তু ষাটের দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতার চৈতন্যে অর্থনৈতিক সচেতনতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এটি বাংলাদেশের কবিতায় নতুন। চল্লিশের দশক থেকেই এই কবিতা রাজনীতি তথা জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। বাংলাদেশের কবিতা মূলত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগে কম্পমান ছিল। এর পাশাপাশি ক্ষীণধারা হিসেবে ছিল আধুনিক জীবনবাদী একটি ধারা। পঞ্চাশের দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতা নতুন প্রজন্মের হাতে আধুনিকতাবাদকে পরিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের কবিতার চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দেয়। কবিতা রাজনীতিকে আলিঙ্গন করে অধিকতর উষ্ণ হতে থাকে। কিন্তু ষাটের দশকে এসে কবিতা পূর্ব বাংলার সার্বিক মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত হতে থাকে। কবিতা রাজনীতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতির পাশাপাশি অর্থনীতিকেও আত্মস্থ করে। পঞ্চাশের দশকে বা ষাটের দশকের শুরুতে কখনো কখনো চকিতে কবিতায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। কিন্তু ষাটের দশকের ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে কবিতায়

অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে ছায়াপাত ঘটায়। কারণ এসময় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক যাবতীয় সংঘাত-সংঘর্ষের মূলে আবিষ্কৃত হয় অর্থনীতি। বিশেষত 'দুই অর্থনীতি'র ধারণা[১০] ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার পর এবং ছয়দফা আন্দোলনের পর থেকে অর্থনৈতিক বিষয়টি সারা পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে প্রধান বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। এ সময় থেকে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যই পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে, এর প্রভাব ষাটের কবিতার ওপরও পড়েছে।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা-বৈষম্য এবং তজ্জনিত ক্ষোভ-বিক্ষোভ, ন্যায্যহিস্যা বুঝে নেওয়ার জাতীয়তাবাদী চৈতন্য, ষাটের কবিতাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। অর্থাৎ কবিতা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণকারী অর্থনীতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। তবে স্মরণ রাখা জরুরি যে, এটি ষাটের কবিতার খালি চোখে দেখার মতো কোনো প্রবণতা নয়। এই প্রবণতাটি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রিয়াশীল দেশ-কাল সচেতন অনেক কবির মধ্যে কখনো চকিতে[১১] কখনো পরিকল্পিতভাবে দেখা দিয়েছে। সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) যখন তাঁর কবিতায় পূর্ব বাংলাকে 'লুণ্ঠিত মজুরের' বাংলা বা 'শোষিতের বাঙলা' বলেন, তখন কবির অর্থনৈতিক সচেতনতার কথাই প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে পক্ষ-বিপক্ষের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে– 'কুণ্ঠিত কৃষকের লুণ্ঠিত মজুরের/লাঞ্ছিত শ্রমিকের বাঙলা/জরামারীজীর্ণ ভাগ্য-বিদীর্ণ/জেলে তাঁতি মাঝিদের বাঙলা।/শোষিতের বাঙলা পতিতের বাঙলা/পীড়িতের জননী বাঙলা/ভিখারীর বাঙলা ভুখারীর বাঙলা/অনাথের জননী বাঙলা।' (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৫৮) উদ্ধৃতাংশে কবিতার শোণিতে কবির অর্থনৈতিক শ্রেণিচেতনা আর বৈষম্য ও শোষণ প্রক্রিয়ার চেতনা বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। আবার কোনো কোনো কবির কবিতার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের বোধ এত তীব্র যে, এই বোধ কবির ভাষাকে পর্যন্ত অসহিষ্ণু করে তুলেছে –

> হারিয়ে কানের সোনা এ-বিপাকে কাঁদো কি কাতরা?
> বাইরে দারুণ ঝড়ে নুয়ে পড়ে আনাজের ডাল,
> তস্করের হাত থেকে জেয়র কি পাওয়া যায় ত্বরা –
> সে কানেট পরে আছে হয়তো বা চোরের ছিনাল! (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০২)

উদ্ধৃতাংশের শেষ চরণে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন আর সমৃদ্ধি অর্জনের বাস্তবতা যেভাবে ফুটে উঠেছে তা বিস্ময়কর বৈ কি! অথবা কবি যখন বলেন, 'তোমার দুধের বাটি খেয়ে যাবে সোনার মেকুর/না দেখার ভান করে কতকাল দেখবে চঞ্চলা ?' (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০২) তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, অর্থনৈতিক লুণ্ঠন কবিচৈতন্যকে কীভাবে আঘাত করেছে, যার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে এরকম

দ্রোহী চরণ। একই ধরনের অর্থনৈতিক শোষণের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে আরো অনেক কবির কবিতায়। অনেক জায়গায় কবির মধ্যে শোষণের বোধের পাশাপাশি সেই শোষণের শোধ নেওয়া শপথও ব্যঞ্জিত হয়েছে–

আমার দেশের ফসল নিয়েছো তুমি
আমাকে দিয়েছো সমূহ সর্বনাশ
তোমার ওখানে মরুতে ফসল এলো
ধু ধু অনাহারে কেটেছে আমার দিন
তোমার পাপের তালিকা আমার কাছে
যত্নে রেখেছি আমারি রক্তে লিখে
শোধ নেবো শোনো একটি একটি ক'রে
আজকে তোমার মুক্তির পথ নেই। (ফজল ২১০২ : ১৪৭/১)

আবার কোনো কোনো কবির মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টি এসেছে একটু ভিন্ন ভঙ্গি ও ভাষায়; অনেকটা যেন মার্কসবাদী চেতনার রঙে রঙিন হয়ে। মহাদেব সাহার *এই গৃহ এই সন্ন্যাস* কাব্যগ্রন্থের 'আমার দুঃখগুলি' কবিতার এক পর্যায়ে কবি তাঁর সাধারণ দুঃখকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

হে আমার দুঃখগুলি, তোমার জন্যে কখন
বলো স্মরণের রম্য দীপ জ্বালাই,
কেননা আমাকে পুড়তে হয় প্রখর ভাদ্রের রৌদ্রে, যখন
লোকালয়ে সেতু বাঁধি, আর বাঁধ দিই প্রবল বন্যার
মুখে, কিংবা মে'র প্রত্যুষে শ্লোগানে প্রতিষ্ঠা
করি প্রাণের একান্ত কাছে সাহসের সুতীব্র
সূর্যটা এনে, তবুও ক্ষুধায় দুর্বল শিশুটা দেখো
ভেঙে পড়ে অবাধ্য রোদনে। (মহাদেব ২০১১ : ৪১/১)

জনমনে অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টি একদিনে খোলাসা হয়নি। ক্রমে ক্রমে অথনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষত ছয়দফা আন্দোলন বিষয়টিকে গণ পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল। ছয়দফা গণভিত্তি পেয়ে গেলে সেই গণচৈতন্য ছায়া ফেলেছে কবিদের চেতনায়। ফলে, অর্থনৈতিক শোষণ আর তা থেকে মুক্তির বিষয় কবিতায় বাঙ্ময় হয়েছে। কোনো কোনো কবি শোষকের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে বলেছেন একটু ব্যঙ্গাত্মকভাবে। কবি অনুভব করেছেন 'ত্রাণকর্তা' হিসেবে আগত কালো পোশাকধারী 'বিরাণ' অঞ্চলের অধিবাসী মূলত শোষক আর প্রবঞ্চক। তাই সবাইকে কবি আহ্বান করেছেন 'মানুষখেকো' শোষক খেদাবার জন্য –

ভাবতে ভাবতে যখন চোখে
কাটলো ধুলোর ধাঁধা
চিনলো সবাই, বন্ধু বেশে
কালকেউটের দাদা
কিংবা বিকট হালুম-দেঁতো
মানুষ খেকোর খুড়ো
ঠাঁই নিয়েছে কাঁধে যেমন
সিন্দাবাদের বুড়ো।
জিন-খ্যাদাবার মন্ত্রপড়া
এমন মরিচ-গুড়ো
হাজার হাজার ভাঙা কুলোয়
উড়ো সবাই উড়ো। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪২৪)

কবিতায় স্বাধীনতার শপথ ও প্রতিরোধ

একটি জাতির মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদী চেতনা চূড়ান্তভাবে জমাট বাঁধে তখন সেই জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পাকিস্তানি শাসনের মধ্যে থেকে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মধ্যেও অনুরূপ লক্ষ করা যায়। ষাটের দশকের উপান্তে, বা বলা যায় ৭০-এর পরে বাঙালির মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার বাসনায় আন্দোলিত হতে থাকে সমগ্র পূর্ব বাংলা। নির্বাচনে জয়লাভের পরও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিচিত্র তালবাহানা বাঙালিকে ক্রমাগত সন্দিহান আর উত্তেজিত করে তোলে। ১৯৭১ সালের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় চলতে থাকে ক্রমাগত হরতাল অবরোধ। এর বিপরীতে চলতে থাকে পাকিস্তানি সেনা-পুলিশের দমন-নির্যাতন। ইথারে ভাসতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলা আক্রমণের খবর। দিন যত গড়িয়েছে, পূর্ব বাংলা তত দ্বিধাহীন ফুঁসে উঠেছে; পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে স্বাধীনতার বিষয়টি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কবিদের লেখনীতেও বাণীবদ্ধ হতে শুরু করেছে কবিতা নয় যেন ঘোষণা–

রক্তচোখের আগুন মেখে ঝলসে-যাওয়া
আমার বছরগুলো
আজকে যখন হাতের মুঠোয়
কণ্ঠনালীর খুনপিয়াসী ছুরি,
কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে
কেউটে সাপের ঝাঁপি!
আমার হাতেই নিলাম আমার

নির্ভরতার চাবি;
তুমি আমার আকাশ থেকে
সরাও তোমার ছায়া,
তুমি বাঙলা ছাড়ো। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৭২)

এই কবিতার ঘোষণার মর্মমূলে রয়েছে প্রবল গণজাগরণ। এই রাজনৈতিক গণজাগরণের বাস্তবতার মধ্যে কবিদের কবিতায় রচিত হতে শুরু করেছে স্বাধীনতার কবিতা; পাকিস্তানি আক্রমণ-নির্যাতনের কথা। এসব কবিতায় পাকিস্তানি আক্রমণ, নিরীহ বাঙালি নিধনের পরিস্থিতি যেমন সরাসরি ভান-ভণিতা ছাড়া উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে বাঙালির প্রতিরোধ আর স্বাধীনতার প্রশ্নে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা –

রৌদ্র যার বন্ধু ছিল, বৃষ্টি যার গোপন-প্রেমিকা,
অগ্নি যার বুকের উদ্ভাস, বাংলার মাটি ছুঁয়ে
সে এখন প্রতিবাদী মুখোমুখি দুরন্ত যুবক।
তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে তাকে ?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।
আশৈশব স্বাধীনতা লোভে যে যুবক
হিংসাহীন প্রেমের বিক্ষোভে বলেছিল :
'যুদ্ধ নয়, ভালোবেসে জিতে নেবো তারে'
মানুষের মৃত হাড়ে সে এখন মৃত সশস্ত্র সন্ত্রাস।
তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে তাকে ?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৭২/১)

অন্য কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে নিধন আর প্রতিরোধী চেতনা –

নদীর ওপরে ঢেউ নেই শান্ত বিশাল বিকেল
যাচ্ছে ভেসে ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহগুলি
আর কতোকাল আর কতোদূরে স্বাধীনতা তুমি
অস্ত্র দাও অস্ত্র চায় মৃতের অঙ্গুলি। (ফজল ২০১২ : ১৪৫/১)

জাতিরাষ্ট্র গঠনের মন্ত্রবলে উদ্বুদ্ধ গণজাগরণ যেমন এসব কবিতাকে প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি এসব কবিতাও সমকালে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো শাণিত ও শক্তিশালী করে তুলেছে। শামসুর রাহমান তাঁর *বন্দী শিবির থেকে* কাব্যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন স্বাধীনতার প্রশ্নে। তিনি বলেছেন, স্বৈরশাসন তাঁর বাক-স্বাধীনতা হরণ করেছে। বিশেষত, স্বাধীনতা নামক শব্দটি কবি লিখতেই পারেন না। কারণ তাঁকে লিখতে দেওয়া হয় না। কিন্তু ষাটের দশকের একেবারে উপান্তে পূর্ব বাংলার মানুষের

মধ্যকার জাতীয়তাবাদী জাগরণ কবিকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করেছে। কবি মনে করেন, স্বাধীনতার বিষয়টি এখন আর কেবল কবি এবং কবির কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন স্বপ্নাঞ্জন মেখে দিয়েছে কোটি বাঙালির চোখে। কবির ভাষায়– 'অথচ জানে না ওরা কেউ/গাছের পাতায়, ফুটপাতে/পাখির পালকে কিংবা নারীর দু'চোখে/পথের ধুলায়/বস্তির দুরন্ত ছেলেটার/হাতের মুঠোয়/সর্বদাই দেখি জ্বলে স্বাধীনতা নামক শব্দটি।' (শামসুর ২০১২ : ৩২৬/১) একই ধরনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে কবি যখন বলেছেন, 'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত/ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,/নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক/এই বাংলায়/তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।' (শামসুর ২০১২ : ৩২৮/১) এই স্বাধীনতাই তো জাতীয়তাবাদী চেতনার কাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট।

সৃজনিপ্রতিভা কোনো গায়েবি বিষয় নয়। স্বদেশের জল-কাদা-আলো-বাতাসেই তার উদ্ভব, পরিপুষ্টি ও বিকাশ ঘটে। এই কারণেই স্বদেশকে কবিরা উপমিত করেন মায়ের সঙ্গে। মায়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, নিপীড়ন-জাগরণ অনুরণন তোলে সৃজনশীল সত্তায়। স্বদেশ আর সৃজনপ্রতিভার এই আন্তঃসম্পর্ক বোঝার জন্য মাথায় বইয়ের বোঝা নিয়ে ঘুরতে হয় না – সৃষ্টিশীলদের সৃজনকর্মের গভীর ও বহুমুখী পাঠই যথেষ্ঠ। বাংলাদেশের বিশ শতকের ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা আর ওই কালের বাঙালি জাতির জাতীয় চৈতন্যের গতিবিধি এই সূত্রেই গাঁটছড়া বাঁধা। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির জাতীয়তাবাদী জাগরণ আর সমকালের কবিতা যেন বাঙালির একই ইতিহাসের দুটি উৎসারণ : একটি রাজনৈতিক ইতিহাস অন্যটি ওই একই ইতিহাসের শিল্পভাষ্য।

টীকা

১. শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস-ঐতিহ্য নয়, সাহিত্যের ঐতিহ্যের উল্লেখও এই সময়ের কবিতার মধ্যে লক্ষ করা যায়। যা কিছু পূর্ব বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-ঐতিহ্য তাই নিয়েই ষাটের কবিতা অহংকার করেছে। যেমন, হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) তাঁর *অলৌকিক স্টিমার* (১৯৭৩) কাব্যের 'তার করতল' কবিতায় করতলকে বৈষ্ণব পদাবলির বইয়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন– 'করতল হয় তার বৈষ্ণব পদাবলির কবিতার বই।' (হুমায়ুন ২০০৮ : ৪৬) একইভাবে *ময়মনসিংহ গীতিকার* প্রসঙ্গও কবিতায় সাহিত্য-ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতার মধ্যে পূর্ব বাংলার এই সাহিত্য-ঐতিহ্যের উল্লেখ ষাটের কোনো কোনো কবির কবিতাকে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ওমর আলী (১৯৩৯-২০১৫)-এর *নদী* (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থের 'পালং' কবিতা থেকে–

গভীর রাত্রে গজারী গাছের তলে
হোমরা বেদের প্রেতাত্মা বুঝি কাঁদে,

আকাশের চোখ সমবেদনায় বুঝি গলে,
শিশিরের ফোটা গড়ায় আর্তনাদে।
মাটির দরজা মুক্ত অন্ধকারে,
দুজনে তখন নির্জন নদী পাড়ে,
নদের কণ্ঠ উজ্জ্বল ফুলভারে,
পেলব কান্তি মহুয়ার সাদা হাড়ে। (ওমর ২০০২ : ৩১০-৩১১)

শুধু সাহিত্য-ঐতিহ্য নয়, এই সময়ের কবিতায় বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কবি-সাহিত্যিকরাও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্মরিত হয়েছেন। এদিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, ষাটের প্রথমার্ধের কবিতায় কবিরা রবীন্দ্রনাথকেই মূলত তাঁদের প্রেরণা আর সাহিত্যিক-ঐতিহ্য হিসেবে রূপায়ণ করেছেন। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই প্রেরণা আর ঐতিহ্যের বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরো অনেকে। যেমন –

পলিরঙ হাত দিয়ে অঙ্গার কালো শ্লেটের ওপর
যখনই প্রথম লিখলে আদ্যাক্ষর 'অ',
লিখলে একটি সভ্যতার নাম।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আলাওলের হাতে তুলে দিলে কুন্দকুসুম,
প্রীতি উপহার বিনিময়ে পেলে ছাড়পত্র হাতে
নজরুল-রবীন্দ্রের মহতী সভার। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৩৯/১)

ষাটের দশকে 'বিদ্যাপতি' 'চণ্ডীদাস' 'রবীন্দ্রনাথ'-এর স্মরণ এবং শরণ কোনোটিই সহজ-স্বাভাবিক ছিল না। কারণ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের তা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। অথচ জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিন্নতার কারণে পূর্ব বাংলার কবিরা হামেশাই সেই কাজটিই করেছেন সচেতনভাবে। ফলে, এসব সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের উল্লেখ শুধু উল্লেখ নয়, এর সঙ্গে জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের রয়েছে এক গভীর রাজনৈতিক যোগ।

শুধু সাহিত্য ও সাহিত্যিক-ঐতিহ্যই নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন, নববর্ষ ও নবান্ন উৎসব। আবহমান কাল ধরে গ্রাম-বাংলায় বিচিত্র মেলা, হালখাতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালিত হলেও ৬০-এর দশকে এসে পূর্ব বাংলায় – বিশেষত নাগরিক পর্যায়ে – জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসেবে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হয়। ব্যাপকভাবে পূর্ব বাংলায় নববর্ষ পালনের প্রচলন হয় ১৯৬৪ সাল থেকে। ১৯৬৪ সালের 'এই পটভূমিতে ১৯৬৬ সালে নববর্ষ নতুন উদ্দীপনা ও জঙ্গীপনা নিয়ে পালিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রভাতফেরি। রাজপথে এতে ছাত্র-জনতার ঢল নামে। অভাবিত লোক-সমাবেশে ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির কারণে সরকারও বিচলিত হয়ে ওঠে।' (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ৩১৩) এইভাবে নববর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার নাগরিক

সমাজ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইসলামি সংস্কৃতির বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্কৃতির জানান দিয়েছিল। কীর্তন-পদাবলি পরিবেশন, মেয়েদের বিশেষ সাজসজ্জা, নৃত্য-গীতাদির মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালন করে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য জানান দিয়েছিল পূর্ব বাংলার সচেতন মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ। অর্থাৎ সেদিন নববর্ষ পালন পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছিল। একারণেই বোধ করি ষাটের দশকের এই নববর্ষ উদ্‌যাপন পাকিস্তানপন্থিদের পাকিস্তানি তাহজিব-তমদ্দুন বিরোধী বিষয় হিসেবে সেদিন যথেষ্ঠ সমালোচনার শিকার হয়েছিল।

বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়বাহী এই ধরনের আরো উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে দিনদিন। নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে যুক্ত হয়েছে নবান্ন। নবান্ন আগেও পালিত হতো। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে নবান্নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক অহংকার ও স্বকীয়তার মতো জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনা। একারণে কবি বলেছেন, 'এখন ফসল নেই বাংলাদেশে অথচ সবাই/কী ক'রে মেতেছো বলো,/প্রাচীন বিশাল সেই নবান্নের মাতাল উৎসবে।' (ফজল ২০১২ : ১৪৮/১) বলাই বাহুল্য এই উৎসবে সংস্কৃতির চেয়ে রাজনীতিই মুখ্য।

২. ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় একুশের রূপায়ণের ধরন ধরা পড়েছে সিকান্দার আবু জাফরের *মালবকৌশিক* (১৯৬৬)-নামক গানের বইয়ের ২০৩ সংখ্যক গানে। সেখানে কবি খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করে বাঙালিকে একটি সূতায় গেঁথে দিয়েছে। স্পষ্টীকরণের জন্য পুরো গানটি তুলে দেয়া হল–

একুশে ফেব্রুয়ারী,
মৃত্যুর শীষে যারা রেখে গেলো
প্রাণ-ফসলের দান
তুমি ইতিহাস বহো তারি।
শাসন-ত্রাসের প্রহার-পিষ্ট জাতি
বিস্ময়ে দেখে, সহসা ভেঙেছে রাতি,
বক্ষ-রুধির রক্ত-আলোকে
আনলো যারা প্রভাত,
তুমি গৌরব বহো তারি।
ভাষাহীন বুকে প্রাণস্পন্দন
আনে না দৃপ্ত জীবন-ছন্দ,
প্রাণপণে তাই ভাষার যাহারা
অধিকার দিয়ে গেলো
তুমি সম্মান বহো তারি।

জোয়ার এসেছে আমাদের মরা
জীবনের সৈকতে
যাদের পরম আত্মত্যাগের পথে
আমরা ধন্য তারা আমাদের ভাই
আমরা ধন্য এমন পুণ্য
কারো ইতিহাসে নাই।
প্রাণ দিয়ে যারা বাঙালীর প্রাণ বেঁধে গেলো এক সুরে
মৃত্যু-বিহীন পরশ তাদের
চিত্তে নিয়েছি পুরে।
এ-যুগের লিপি মুছে যাবে তবু
এ-জাতি তাদের ভুলবে না কভু,
এ-প্রভাতে জেগে দেশবাসী নাও
নতুন শপথ তারি,
এসেছে আবার অশ্রু-ঝরানো
রক্ত-ক্ষরানো স্মরণ জড়ানো
একুশে ফেব্রুয়ারী।
সংশয়াহত নিথর চিত্তে
বন্যা-অবাধ শক্তি জাগানো
একুশে ফেব্রুয়ারী।। (সিকান্দার ২০১৭ : ৩১৮)

৩. কখনো কখনো কবিরা জাতির প্রয়োজনে আত্মাহুতি দেয়ার জন্য ডাক দেন। ষাটের দশকের কোনো কোনো কবির কবিতায় এই বিষয়টি লক্ষ করা যায় –

কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুন হতে হয়।
যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়। (হেলাল ২০১৭ : ৯)

৪. ১৯৬৫ সালে লাহোরে বাঙালি সেনাদের ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার কৃতিত্বের যথার্থ স্বীকৃতি না-দেয়া বিষয়ে দেখা যেতে পারে মিজানুর রহমান চৌধুরী (২০১১)-এর *রাজনীতির তিনকাল* গ্রন্থের পৃষ্ঠা-৭৩; মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৪)-এর *স্বাধীনতার পটভূমি : ১৯৬০ দশক* গ্রন্থের ১০১-১০৩ পৃষ্ঠা এবং আতাউর রহমান খান (২০০১)-এর *স্বৈরাচারের দশ বছর* গ্রন্থের ২৬১ পৃষ্ঠা। আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম (২০১৮) তাঁর *বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি* গ্রন্থে বলেছেন 'সম্ভবত এই অঞ্চলের [পূর্ব বাংলার] জনগণকে নন-মার্শাল মনে করা হত'। (আবুসাদাত ২০১৮ : ৩১)

৫. ১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)-এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নিয়ম অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। আর তাঁর দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংবিধান প্রণয়ন করার কথা। নির্বাচনের পূর্বে কথাও ছিল তাই যে, নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি থেকে শুরু করে অভিজাত শ্রেণির সবাই হতবাক হয়ে যায়। তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে, একজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন করবে; কর্তৃত্ব করবে। এজন্য অত্যন্ত অন্যায্যভাবে টালবাহানা করে ক্ষমতা হস্তান্তর তো করেইনি, বরং অস্ত্রের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে চির স্তব্ধ করতে চেয়েছিল।

৬. বাঙালি কবির অনার্যত্বের অহংকার স্বাধীনতার পরের কবিতার মধ্যেও লক্ষ করা গিয়েছে। এমনকি এই অহংকার থেকে মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯) একটি কাব্যের নামকরণ করেছেন *আমরা তামাটে জাতি* (১৯৮১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই কাব্যের 'শিকড়গুলো' কবিতার কথা। (মুহম্মদ নূরুল ২০১৬ : ১৬৬/১)

৭. এ প্রসঙ্গে অনেক কবিতা উল্লেখ করা যাবে। সিকান্দার আবু জাফরের *বাংলা ছাড়ো* (১৯৭১) কাব্যের 'ইতিহাসচারিণী বাঙলা' কবিতার নিম্নোক্ত অংশে বিষয়টি একেবারে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে –

> কুণ্ঠিত কৃষকের লুণ্ঠিত মজুরের
> লাঞ্ছিত শ্রমিকের বাঙলা
> জরামারীজীর্ণ ভাগ্য-বিদীর্ণ
> জেলে তাঁতি মাঝিদের বাঙলা।
> শোষিতের বাঙলা পতিতের বাঙলা
> পীড়িতের জননী বাঙলা
> ভিখারীর বাঙলা ভুখারীর বাঙলা
> অনাথের জননী বাঙলা। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৫৮)

তবে, ষাটের দশকের পূর্ব বাংলার প্রায় সব কবিই বাঙালির এই পরিচয় নিয়ে অহংকার বোধ করেছেন। বাঙালি কবিরা বাঙালি জাতির এই 'অনার্য'সুলভ পরিচয় দেয়ার পাশাপাশি এই জাতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, এই জাতি বরাবরই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার। (দ্রষ্টব্য, সিকান্দার আবু জাফরের *বাংলা ছাড়ো* কাব্যের 'গরবিনী মা-জননী' কবিতা।)

৮. সত্যেন সেনের *পুরুষমেধ* উপন্যাস থেকে লক্ষ করা যাক–

> অনার্য জাতি বলে কোনো জাতি নাই। ওই মিথ্যা নামটি আপনারা আর্যরাই সৃষ্টি করেছেন, তারপর সেটাকে জোর করে আমাদের উপর ['অনার্যদের' উপর] চাপিয়ে

> দিয়েছেন। ... শান্তির দেশ শান্তিতেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময় ঈশান কোণ থেকে ঝড়ের মত নেমে এল দুরন্ত দস্যুর দল (আর্যরা)। ক্ষুধিত বৃকের মত পালের পর পাল ওরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ... প্রাচীর, অট্টালিকা, উদ্যান, স্নানাগার সবকিছু ভেঙে চুরমার করল ওরা। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করল। (সত্যেন ২০০৩ : ২০০)

৯. এছাড়া বাঙালির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ কবিতায় এনে এর মাধ্যমে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য নির্মাণের জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টা ষাটের দশকে অন্য অনেক কবির মধ্যেই লক্ষ করা যায়। যেমন, শামসুর রাহমান তাঁর *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩) ও *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৭) কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক কবিতা রচনা তো করেছেনই, এমন কি *নিজ বাসভূমে* কাব্যে নিকট অতীতে মৃত্যুবরণ করা বাঙালির অহংকার করার মতো মনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) এবং কবিয়াল রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭)-কে নিয়ে রচনা করেছেন যথাক্রমে 'গ্রন্থে আছেন শহীদুল্লাহ্', 'কবিয়াল রমেশ শীল' নামক কবিতা। এসব কবিতায় কবি বাঙালির নিকট অতীতের গুরুত্বপূর্ণ এসব ব্যক্তিদের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী আবেগকে ঘনীভূত করতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে এঁদের সাহিত্যে ও জীবনে যে-চেতনা প্রকাশিত হয়েছিল রাহমান সেই চেতনার জাগরণ চেয়েছেন বাংলায়। যেমন, জীবিত থাকলেও সৃজনশীলতার দিক থেকে মৃত নজরুল সম্পর্কে এক কবিতায় বলেছেন– 'এখন আপনি সেই যাত্রী আত্মভোলা, হঠাৎ যে নেমে পড়ে/ভুল ইস্টিশানে অবেলায়।/তবু আপনার মতো কারুকেই চাই, চাই আজও নজরুল ইসলাম।' (শামসুর ২০১২ : ২৮৪/১) একইভাবে রমেশ শীলের সেই চেতনাকে কবি অঙ্কন করেছেন যে-চেতনা দিয়ে রমেশ শীল কবিগানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। রমেশ শীলের যে-মূর্তি এঁকেছেন তা সমকালের জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎসারণের জন্যে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ–

> স্বদেশকে প্রিয়ার একান্ত নাম ধরে ডেকে ডেকে
> অগ্নিবলয়ের মধ্যে গড়েছিলে প্রেমের প্রতিমা
> নিজে পুড়ে পুড়ে।
> তোমার প্রেমার্ত স্বর ছাপ্পান্ন হাজার
> একশো ছাব্বিশ বর্গমাইলে আনাচে-কানাচে
> পৌঁছে গেছে। বাউলের গেরুয়া বস্ত্রের মতো মাটি, মাছ আর আকাশের কাছে
> নদীর বাঁকের কাছে, মজুরের ক্ষিপ্র, পেশি অত্যাচারী শাসক-দুপুরে (sic)
> কৃষকের হাল-ধরা মুঠোর কাছেই তুমি শিখেছিলে ভাষা। (শামসুর ২০১২ : ১৮৫-১৮৬/১)

একই ধরনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়, আসাদ চৌধুরীর *তবক দেওয়া পান* কাব্যের 'নতুন সবক চাই' কবিতায়। এই কবিতায় কবি বলেছেন –

> সব শব্দ কালো হ'য়ে গেছে একালের অভিধানে!
> দীপ্তিহীন, রক্তহীন, ফ্যাকাসে, পান্ডুর হ'য়ে

ক্ষয়ে ক্ষয়ে লীন হচ্ছে
পদাবলী, হায় শব্দাবলী,
তোমার বিশাল বুকে, হে সর্দার, মাথা রেখে আমি
কিছুকাল একাকী কাটাবো। নতুন সবক নেবো।
কম্পিত আঙুল দিয়ে তুমি মোরে লিখন লেখাবে ? (আসাদ ২০০৮ : ৪৪)

১০. পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদরা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি উপলব্ধি করলেন যে, অখণ্ড জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আওতায় পূর্ব বাংলার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব নয়। বরং পূর্ব বাংলা শোষিত ও বঞ্চিত হতেই থাকবে। এজন্য তাঁরা ১৯৫৬ সালের আগস্টে পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রস্তাব করেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তান' ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা আলাদা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হবে। ১৯৫৬ সালের উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. এম. এন হুদা, ড. মাযহারুল হক, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, এম. এ রাজ্জাক, এ. এফ, এ হুসাইন ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক। উক্ত আলোচনায় তাঁদের মতামত সংবলিত একটি প্রতিবেদন তাঁরা তৈরি করেন। আলোচনার মতামতগুলো নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'রিপোর্টটি পাকিস্তানের পরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো হিসেবে দ্বৈত অর্থনীতির ধারণাকে বেশ জোরের সঙ্গে উপস্থাপন করে।' (নুরুল ২০০৭ : ২১) ষাটের দশকে এসে এই দুই অর্থনীতির ধারণা পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের রসদের অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছিল।

১১. হাসান হাফিজুর রহমানের *অন্তিম শরের মতো* (১৯৬৮) কাব্যগ্রন্থের 'গ্রহণগ্রস্ত নগরী' কবিতাটির আয়োজন মূলত আইয়ুবি স্বৈর শাসনত্রাসনে নিষ্ফলা ঢাকা নগরীকে নিয়ে। কিন্তু কবিতাটিতে হাসান হাফিজুর রহমান যখন চকিতে বলে ওঠেন 'বংশপরম্পরায়/কলোনি স্বদেশ আমার', তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনৈতিক শোষণকেই কবি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, তখন অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টিই পূর্ব বাংলার সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল।

সহায়কপঞ্জি

আতাউর রহমান খান (২০০১)। *স্বৈরাচারের দশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

আবুল হোসেন (১৯৯৭)। *আবুল হোসেনের নির্বাচিত কবিতা*, ব্যতিক্রম প্রকাশনী, ঢাকা

আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম (২০১৮)। *বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি* (অনু. মশিউল আলম), চতুর্থ মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আমিনুর রহমান সুলতান (১৯৯৮)। *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আল মাহমুদ (২০০০)। *কবিতাসমগ্র*, দ্বিতীয় প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা

আল মাহমুদ (২০০৩)। *সাক্ষাৎকার : আল মাহমুদ* (সম্পা. সাজ্জাদ বিপ্লব), ঐতিহ্য, ঢাকা

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০০৬)। *কবিতাসমগ্র* ১, গতিধারা, ঢাকা

আহমদ রফিক (২০০১)। *কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*, অনন্যা, ঢাকা

আহসান হাবীব (১৯৯৫)। *আহসান হাবীব রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

কুদরত-ই-হুদা (২০১৬)। *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আদর্শ ঢাকা

নির্মলেন্দু গুণ (২০১১)। *কাব্যসমগ্র-১*, চতুর্থ সংস্করণ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা

নুরুল ইসলাম (২০০৭)। *বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

ফজল শাহাবুদ্দীন (২০১২)। *কাব্য সমগ্র-১*, অনন্যা, ঢাকা

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯)। *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৯৩)। *স্বদেশ ও সাহিত্য*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মহাদেব সাহা (২০১১)। *কাব্যসমগ্র-১*, চতুর্থ প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মিজানুর রহমান চৌধুরী (২০০১)। *রাজনীতির তিনকাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা

মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমদ (২০১৪)। *পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, পঞ্চম মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা (২০১৬)। *কবিতাসমগ্র-১*, অনন্যা, ঢাকা

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৪)। *স্বাধীনতার পটভূমি : ১৯৬০ দশক*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৯৮)। *মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্যসংগ্রহ*, প্রতীতি প্রকাশনী, ঢাকা

মোহাম্মদ হাননান (২০০৬)। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ৩য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

শহীদ ইকবাল (২০১৩)। *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস : ১৯৪৭-২০০০*, রোদেলা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০১২)। *কবিতাসমগ্র-১*, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা

সত্যেন সেন (২০০৩)। *কুমারজীব*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা

সানাউল হক (১৯৯৮)। *সানাউল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সিকান্দার আবু জাফর (২০১৭)। *কবিতাসমগ্র*, বিভাস, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৈয়দ আলী আহসান (২০০৯)। *কবিতা সমগ্র*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক (২০১২)। *কবিতাসমগ্র ১*, প্রথম মুদ্রণ, চারুলিপি, ঢাকা

সৌমিত্র শেখর (২০১১)। *ষাটের কবিতা : ভালোবাসার শরবিদ্ধ কবিকুল*, বিভাস, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৯৪)। *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। *কাব্যসমগ্র*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হেলাল হাফিজ (২০১৭)। *যে জলে আগুন জ্বলে*, অষ্টাবিংশ মুদ্রণ, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা

Mohammad Ayub Khan (2008). *Friends Not Masters*, The University Press Limited, Dhaka